গঙ্ঘারাটে।

[ ২ ]

বহু মনোরথ পূর্বে আছিল গঙ্ঘার।
যমুনার দেখি কুঠ চন্দ্রের বিহার।
‘কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।’
nিরবধি গঙ্ঘ। এই বলিলেন রাক্ষ।
যথাপিশগঙ্ঘ। অঙ্গ-ভাবাদি বন্ধুত।
তথাপিশ যমুনার পদ সে বাঙ্গল।
বাঙ্গা কলোথ প্রভু স্ত্রীগোর সুন্দর।
জাহানীর বাঙ্গা পূর্ণ করে নিরস্ত।

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত।

পতিতপাবনী বিশ্বভক্তি-প্রদর্শনী ভগবতী জাহানী আঞ্চলকৃপ-ধানের পদ-প্রাপ্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন; এখনও সহস্র
সহস্র নরনারী বালক বালিকা গঙ্ঘারাটে স্নান করেন। তাহাদের
ভক্তিমাতা আনন্দমূর্তি দেখিলে হদয়ে তৎক্ষন তাব জাগিল। উঠে,
বালক বালিকাদের সরলতামাথা উদ্দাময় গঙ্ঘারাটে জনিত কলাগোত
মধুর-পবিত্র তিলক-চজ্জিত সুখচিবি দেখিয়া হদয়ে পবিত্রতা,
ভক্তি ও প্রেমানন্দের উদয় হয়, প্রাণের ভিতরে নব ভাবের
সংযার হয়। গঙ্ঘারাটের এই পবিত্র দৃষ্ট, এই স্নায়ময় সংমিলন,
এই প্রেম-পবিত্রতার পুণ্য-খেলা হিন্দুর জারবে চিরিনই পবিত্র।
শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদিতি।

উত্থান আনিয়া দিন্তা হিন্দুকে অজ্ঞাতসারে গৃহের রাজ্যে আক্রমণ করে। গঙ্গাহার পরিচিত সুখদুঃখের সহিত সাক্ষাৎ হয়, অপরিচিতের সহিত আলাপ হয়, পরস্পর কথাবার্তা ঘাটা। মন্দমের ভার লর্ড হয়, আবার তৎক্ষণ-সম্প্রস্থ মন্দমের অনন্ত ও উদগরের সংসার হয়।

গঙ্গাহার কেবল আধ্যাত্মিক উদগর-লাভের মহাত্মাধ্য নয়, সামাজিক সমষ্টিতের মহাত্মাধ। এখানে বৃদ্ধ মহিলাগণ, কুল-বধূগণ ও সংসারের আনন্দকৃত্তম,—কুলমহলুকোমলা বালিকাগণ অবাধে সমবাহিত হয়েন। করণাথীত কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতে চলিয়া। আমাদের দৃষ্টান্তকে বর্তমান সময়ে এই সন্ত্রাস ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছে। এখন আমরা কিছু অতিরিক্ত মাতার শিল্প ও ভূমি হইতেছি।

কিন্তু পূর্বে একুশ ছিল না। গঙ্গাহারকৃত হিন্দু সময় গঙ্গাসান না করাই পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। গঙ্গাসান, গঙ্গারুদ্ধ-ঠাট, গঙ্গাবন্ধন, গঙ্গাহারের সঙ্গাপূজা ও জপন্ধি করা গঙ্গাহারের হিন্দুগণের নিতাহম্ম ছিল। এমন কি কুলমহলুকোমলা অবাধে গঙ্গাহারের আগমন করিতেন, বালিকাগণ পর্যন্ত ভক্তিতে তিনমনস্তা গঙ্গাসান করিত। এ দৃষ্ট দেখিয়া কাহার প্রাণে ভক্তির সংসার না হয়? অমন কণ পাপ-পাপণ,——তাহার প্রাণেও এই প্রেম-পরিত্যাগ ও ভক্তির বিপুল ভাব সন্ধানে দ্বিঃভূত হয়, সেই উদর ক্ষেত্রেও ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হয়।

বর্তমান সময়ে হিন্দুর ধর্মোপাসনা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।
গঙ্গাবাটে।

নরনারীগণের প্রাণে কেমনতার হাস হইতেছে, জাতীয় জীবনের উৎস,—শুক নৌকে ও মান হইয়া পড়িতেছে। ধর্ষ্যভাব, ধর্ষ্যনিষ্ঠা ও ধর্ষ্যকর্ষ্য দ্বারা। জীবনে নে নিত্য অভিনব বল উদ্ধম ও প্রফুল্লতার সঞ্চার হইত, এখন সেই স্থখমোভাবের দিন এককুপ চলিয়া গিয়াছে। তথাপি গঙ্গাবাটে আমরা বিশ্বেপ্তারসির বিলুপ্তগ্রাহ্য নির্দেশনা কৃতি ৫ পরিশোধ চিত্রের অবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাই। জীবনের উদ্ধম, সজীবতা, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও ভক্তির ভাববিকাশ এখনও গঙ্গাবাটে নূতনাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু যদি দুলনের পুণ্য-কাহিনী প্রণ করিয়া এছাড়া এই বিখ্যাত আলোচনা করা যাইতেছে, সেদিন বাঙালীর অতি সৌভাগ্যের দিন,—অতি গৌরবের দিন। বাঙালী সেদিনের কথা তুলিয়া বলিয়াছে, বাঙালী কাঠ পাইয়া কাঞ্চন ভাগ করিয়েছে। পুণ্যধাম নবদ্বীপে চারিশত বৎসর পূর্বে বাঙালীর—কেবল বাঙালীরই বা বলি কেন—সমগ্র জগতের অধিভাষিদের এই যে সৌভাগ্য রাখির উদয় হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অত্যন্ত অতুলনীয় ব্যাপার। বিশ্বাস গৌরবে ও ঐশ্বর্য্যে-বৈষ্ঠতে তথন নবদ্বীপ অবতীর্ণ। নবদ্বীপ তথন ভারতের প্রধানতম বিদ্রোহী, নবদ্বীপ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল না হইলেও প্রধানতম নগর। বর্ষমান কলিকাতা হইতেও তথন নবদ্বীপে লোক সংখ্যা বেশী ছিল। তথন নবদ্বীপের পদ-প্রাপ্ত-বিধারণী পুণ্যযুগল। ভবতি জাহাজের পরিবর্তে তত দিবানিশি লোকের লোকারণ্য হইত। শ্রীপাদ নৃসম্ভবদাস.
ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা নিয়লিখিত কথায় বর্ণনা করিয়াছেন :—

অবতরিতেন প্রভু জানিয়ে বিধাতা ॥
সকল সম্পূর্ণ করি থুঁইলেন তথা ॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বরিতে পারে ।
একক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাপ্ত করে ॥
তিবিধ বয়সে একই জাতি লক্ষ লক্ষ ।
সরস্বতী-দূর্গপাতে সবে মহাদক্ষ ॥
সরে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে ।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষে করে ॥

"নানা দেশ হীতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিলাপরদ পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্ছয় ।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহি নির্গরণ ॥
রমণ-দূর্গপাতে সবলোক স্বখে বসে।
বার্ধক্যে যার মাত্র ব্যবহার-রসে ॥

এই ব্যাপ্তিতে পাঠে জানা যায় নবদ্বীপের একক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গামান করিতেন। নবদ্বীপের এই বিশাল বিপুল বৈভবের সময়ে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র সমৃদিত হয়েন। দয়াময় যখন অবতার হয়েন, তখন চন্দ্রগঞ্জ হল সময়ে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে বে বিপুল লোক-সমাগম ও তুমুল হরিসংকীর্তন রোল উঠিয়াছিল, এখন গঙ্গাঘাটে এই পোপলক্ষে তাহার স্বাতিমাত্র পরিলক্ষিত হয়।
গঙ্গাঘাটে।

শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে গঙ্গার মহিমা আরও বর্ধিত হয়েন। কেন না সকালে ভক্তিদের তৎপূর্বকেই অবতীর্ণা হইয়া শ্রীধর্মকে শ্রীপদ ভক্তগণের শ্রীরূপমি করিয়া তুলিয়াছেন। নীলাকাশে চাদের পাশে নক্ষত্রগণ যেমন সাজিয়া ঢাঙায়, ভক্তগণও চারিদিক হইতে দেইবৈপ্লবীপ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরশেনের উদয়ে গঙ্গাঘাটের ভক্তিলীলা দিন দিন অধিকতর বাড়িয়া উঠিল।

অনুরাগ কুলমহিলাগণের হায় শ্রীশ্রীগৌরশেনের জন্মী নিয়ন্ত্রণে গঙ্গাঘাটন করিতেন। অনেকেই তিস্তুঢ়্যা গঙ্গাঘাটন-ব্রত পালন করিতেন। এথেন বেষ্টন মহিলাগণের সঙ্গে বালক বালিকারা গঙ্গাঘাটন করেন, তথাহি এই রীতি খুব পার্য্যে ছিল।

[ ২ ]

শ্রীশ্রীগৌরস্যুক্ত দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গলা বাড়িতে লাগিল, তখন প্রায়শক্তি গঙ্গাঘাটে তাহাকে দেখা বাইত, সোণার গোপাল, বাণ্যপক্ষের সঙ্গে গঙ্গাঘাটে বিচরণ করিতেন, লোকের পূজার সামগ্রী কাছিয়া লইতেন, বলিতেন,—'তোমরা আমার পূজা কর, আমাকে নেবিয়া দেও, গঙ্গা।

• সহস্ত হইবেন, দেবতারা সহস্ত হইবেন।' লোকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, তাহার রূপে তাহাদের নমন আকৃতি হইত, মধুর অচেতন সৈন্ত কথা কাশের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিত। তাহারা পূজা তুলিয়া পূজার দ্বারা তাহার হাতে অর্পণ করিতেন। শ্রীগৌরস্যা বয়স্ব বালকদের হাতে ভোজ্য দ্বারা দিয়া।
শ্রীশীঘ্রুর-বিকৃত্তির্ম।

gল্লায় বংপালায় পড়িলেন। গল্লায়তে শ্রীগোরাঙ্কের বাল্যলীলা।
কুতু অচ্ছুত কাহিনি। ঠাকুর বৃন্দাবন ইহার যে জীবন্ত চিত্র
অঞ্চিকা রাধিয়াছেন, তহা অতি সখ্যত ও মনোহর। এই দেখিয়া
একটি চিত্র কেঁপঃ—

ধূলায় ধূম প্রভু শ্রীগোরসুদর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর।
পড়িতা শুনিতা সর্ব শিখিয়া সঙ্গে।
গল্লায়তে নামকৃতে চলেন বহু রঙ্গে।
মজ্জ্বা গঙ্গায় বিখ্যাত কুতুহলী।
শিখিয়া সঙ্গে করে জল ফেলাকেলি।
নর্দিয়ার সম্প্রদায় যা কে বলিতে পারে।
অস্ত্র অসুধ্য লোক এক ঘাটে স্মৃতি করে।
কালের যা দান গৃহস্ত, সম্প্রদায়।
না জানি কতেক শিখে মিলে উঠিহ আসি।
সহার লইয়া এই ধূত গঙ্গায় সাঁতারে।
কিরে চূড়ে কিরে ভাগে নানা করিয়া।

শ্রীপাদ ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগোরসুদর। শ্রীশীঘ্রাঙ্কের এই যে চিত্র
অঞ্চিকা তুলিয়াছেন, ইহার তুলনা নাই। নিমাই দাসক, তাহার
হাতে খড় হইয়াছে, তিনি ভালপাদে লিখিতে আরাম্ব করিয়াছেন।
শ্রীগোরসুদরের শ্রীশীঘ্র ধূলায় ধূমরিত, তাহার উপরে আবার লিখন-
কালির বিন্দু পড়িতা এক অচ্ছুত শোভা প্রতিক্ষিয় হইয়াছে। এই
অবস্থায় তিনি শিখিয়ার সঙ্গে নানা রঙ্গে অচ্ছুত করিতে করিতে।
গঙ্গাঘাটে।

গঙ্গাঘাটে চলিয়াছেন,—আর গঙ্গা ঘাটের যত লোক,— এই বালকটির দিকে অনিবার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।

তিনি দেখিতে দেখিতে গঙ্গার ঝাপিয়া পড়িলেন, মধ্য গঙ্গার ঝাপিয়া সাতার কাটিতে লাগিলেন, তীরের লোকেরা দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, কেহ কেহ মনে ভাবে সুখাদি গণিতেন, পাছে বা কি হয়; চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন,
“অরে বালক, গঙ্গায় কুমিল্ল আছে, এখন কুমিল্ল ধরিবে, তোর কি ভয় নাই? মধ্য গঙ্গায় খুলিয়া গেলে কে তোকে তুলিবে?” বলিয়া “ভবসাগরে নিমিত্ত লোকদিগকে উদ্ধার করেন, শ্রেষ্ঠনৌকায় লোকেরা তাহার নিমজ্জন-ভয় করিয়া অধীর হইতে লাগিলেন।

ঈশ্বরশ্রুণ্ডর কাহারও কথায় কাণ না দিয়া।—
সভায় লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাতার।
ক্ষণে ক্ষণে কখনে ভাসে নানা ক্ষুদ্র করে।

নরনারীগণের ইচ্ছা,—নিমাই তীরে উঠেন। বাঙ্গা-কলতন্দ্রের তাহাদের মনের উদ্দেশ্য দূর করিবার জন্য তীরের দিকে আলিয়া হত পা চুড়িয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের এক উপদ্রব হইল:—

জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সভায় গায়তে লাগে চরণের নীর।
সবে মানা করে তবু মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে।
কেবল এইটুকু করিয়াও তিনি নিষ্ঠুর হইতেন না, কেহ চন্দ্র স্মৃতিত করিয়া ধান্য করিতেছেন, নিমাই তাহার মুখে এক এক ছিটা জল দিয়া বলিতেছেন, "ওগো ভুমি কার ধান কর। এই দেখ না,—আমি খুঁড়ী তোমার সুখে আসিয়াছি, একবার নরন মেলিয়া দেখ, আমি প্রত্যক্ষ নারায়ণ,—তোমার সমুখে।"

ধ্যানে ব্রাহ্মণ বালকের কথা শুনিয়া অবাক। বাণীবিকাই তাহার মনে হইল এই কনক-জ্যোতি শিশু বুঝি বর্ষা-মণ্ডলের মধ্য হইতে অবতরণ করিয়া নরন-সমুখে উপস্থিত হইয়াছেন,—কিন্তু বিভূমায় আবার মহিত হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "বুঝো, ভুমি আমার মিরের পুত্র নিমাই। এই দেখ না বাছুঁ তোমার বাপের কাছে;—নজা দেখাব এখন! ধনবদার ফের এমন করো না।"

নিমাই ব্রাহ্মণের মুখে দিয়ে চাহিয়া একটুকু বিক্রমের হাসি হালিয়া। অপর এক ব্রাহ্মণের পুজ্জ্ব শিবলিঙ্গ লইয়া দোড়িলেন। ব্রাহ্মণ পাছে পাছে দোড়িতে লাগিলেন, নিমাই বলিলেন, "এই যে ব্রাহ্মণ আমি এসেছি, আবার এ মুর্তি পূজা কেন?" ব্রাহ্মণ দোড়ির দিয়া বালকে খুঁজিয়া পাইলেন না, ক্ষুষ্কল শক্তিত ভাবে মাড়াইয়া রহিলেন, আবার খুঁজিতে লাগিলেন। এই যে তিনি এবার খুঁজিতে লাগিলেন, ঈহাৎ তাহার ক্রোধ বা জুত্বের ভাব ছিল না। তিনি এবার মনে করিতেছিলেন,-এই যে বালকটি আমার শিবলিঙ্গ কড়িয়া লইল, এ বস্তু কি? বালক বলিল, "এই যে আমি বিয়ং আসিয়াছি,—আবার এ মুর্তি পূজা কেন?" আমি ধানে
বাহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি “রংবন্গ রংবন্গি” কিন্তু ইহার অজ্ঞতা কি মনোহর সর্বকালিকইবিশিষ্ট,—দেহের মধ্য হইতে বন চালের কিরণের মত জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। এই গল্পাঙ্কে প্রতিদিন স্নান করিতে আসি, মানব শিশুরা কখনও এক্ষণ সাহস প্রকাশ করে নাই, এক্ষণ কথাও রুদ্ধ নাই।”

ব্রাহ্মণ গল্পাঙ্কে বলিয়া পড়িলেন, ধ্যানে বিকোর হইলেন। আবার তখন কোথা হইতে চঞ্চল বলক আসিয়া প্রায় টিকি নাড়িয়া বলিলেন—“যোগি-বাবা, একবার চেয়ে দেখ, এই আবার এসেছি,—এবার ঠিক হয়েছে কিনা দেখ দেখি,””ব্রাহ্মণ চাহিয়া দেখিলেন, মহাশেবরের বেশে বুঝ আরোহণ ঠিক সেই বলকটি প্রায় দৃষ্টির সমক্ষে উপস্থিত। এবার প্রায় তাহার জিনিস,—পরিধানে কাঠিবাস। ব্রাহ্মণ মৃদুত ভাবে প্রায় করিলেন; বলক প্রায় টিকি ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন, বলিলেন,—‘হরসরার, আর আমাকে তাড়া করিও না, তাহা হইলে আর কখনও দেখা দিব না।’ এই বলির বলক তখনই সহসা অক্ষর্ধান করিলেন। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পাইলেন নদীর গঙ্গাপূর্বদিকে এতদিনে নিবৃত্তির ফল ফল ফলিল, বহু ভয়বান বালকরূপে গঙ্গাপূর্বে কৃত্তিকার করিয়া বেড়াইতেছেন। অজ্ঞ তাহার নরন ও জীবন ফল হইল। সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণের ভাবনায় উপস্থিত হইল, সে দিন হইতে আর অপর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।
শ্রীশঙ্কর বিধুপূজা।

(৩)

শ্রীশঙ্কর বাঙ্গালা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি নীতি ও নীরাময় গুণাতে শিবপূজা ও বিশ্ব্যপূজা করতেন। ব্রাহ্মণগণ পুষ্প তুলনীয়, বিবর্ধন, দূর্বল, চন্দন নেতৃত্ব প্রদত্ত পূজার সাধনা লইয়া গঙ্গাতে উপস্থিত হইয়া। ভক্তিভাবে কেহ বা শিবপূজা, কেহ বা বিশ্ব্যপূজা, আর কেহ বা গঙ্গাপূজা করিতেন। বাল্মকব্যের বলন্ধরের মধ্যে চঞ্চল নিমাইর একটি খোঁক গঙ্গাঘাটে কিছু বাড়ি-বাড়ি মাত্রায় পরিলক্ষিত হইত। তিনি দেব-পূজকদের নিকটে বেশী বেশী বেশী বেশী করিতেন। শিবপূজকের তিনি নেতৃত্ব ভবের কুপা করিয়াছিলেন, পাঠকগণের অতিরিক্ত পাইয়াছিলেন।

এখন আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন একজন ব্রাহ্মণ গঙ্গাঘাটে বিশ্ব্যপূজার দূর্বল তুলনীয় পুষ্প চন্দন নেতৃত্ব ও বিশ্ব্যর আসন রাখিয়া গঙ্গার অবগাহন করিয়া তীরে উঠিয়াছেন,—চাহিয়া। দেখিয়া এই অবসরে চঞ্চল বালক তাহার আনীত বিশ্ব্যর আসনে বসিয়া বিশ্ব্যনীত্ব ভোজন করিতেন। অঙ্গ ধূলায় ধুসরিত, এই ধূলিমাখা দেহ চন্দনে চাঁচিত হইয়াছে, কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় স্নোধী কঙ্কনকেশ্বরী, উহা ফুলসাজে সজ্জিত, —মুখে মৃদুহাসি, আর বিশ্ব্য-নীত্বের গ্রাস। ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধার হইয়া তারে উঠিলেন, চক্ষু কর্মকর্ম করিয়া নিমাইর প্রতি তাকাইলেন, হই এক কথা বলিতে না বলিয়া নিমাইর তাহার নীত্বের থালা ফেলিয়া। দিয়া হৃষ্ট হাসি হাসিয়া এক দোড়ে পলায়ন করিলেন। আর তাহাকে দেখিয়া গেল না।
গঙ্গাঘাটে।

গঙ্গাঘাটে, তিনি ক্রোধ-কমিত্ত নিমানের প্রতি তিনপি বিক্রিয়া কি বলিয়েছিলেন, কিন্তু নিমান যখন ঢুঁতিয়া গলাইলেন, তখন সহসা গঙ্গাঘাটের ক্রোধের বিরাম হইল,
কিন্তু কি দিয়া বিক্রিয়া করিয়ে, মনে সেই ভাবনা উঠিল, আর এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নিমানের সেই লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যমাঝা মুখখানির কথা গঙ্গাঘাটের মনে পড়িতে লাগিল।

নিমান দৌড়িয়া গলাইলেন বা, কিন্তু কেন-কি এক ভাল-বাসার ভাব গঙ্গাঘাটের সঙ্গে রাখিয়া গেলেন। গঙ্গাঘাট ক্রোধ নিমানের মুখখানি হারিয়ে গলাইলেন।

তিনি মনে করিয়ে গলাইলেন, আমার ক্রোধ দেখিয়া বালকটি দৌড়িয়া গলাইল, কিন্তু উহার মুখখানি কি সুন্দর, মাথাটি চুলগলি অগ্রভাবে কপালের উপর দিয়া চক্ষু পর্যায় হুলিয়া পড়িয়াছে, আব সেই গলকে নিন্দিত চুলগলির মধ্য দিয়া চক্ষু চূলের কমল বালকের কমলের স্বায় চূলটি চক্ষু নেলিয়া। আমার দিকে কেমন হাসিমাঝা চাহিনিতে তাকাইলেন। দেহের এমন রং,—চাওরের এমন চাহিনি,—মাথার এমন চুল, আব এমন লাবণ্যমাঝা অর্জ-গঠন—আব তো কোথাও দেখি নাই। এমন সৌন্দর্য্য হয় এ জগতে সমব? বালক যদি আমার সাজসজ্জ নষ্ট না করিত, তাহা হইলে উহাকে আমি কত ভালবাসিতাম। বালকের বুদ্ধি দেখে ই ধূলি ধৃষ্টিয়া দেহে চন্দন মাথিয়ুচে, আব কপালে কেমন সুন্দর চন্দন-তিলক পড়িয়াছে। দেহখানি ধুলিমাঝা বরে, কিন্তু অসাধারণ জোভিঙ।

*গঙ্গাঘাট হুলিয়েন, পুঞ্জি হুলিয়েন, গঙ্গাঘাটের অসাধারণ প্রতি।*
শ্রীশ্রীগোর-বিখ্যাতিত্ব।

লোক-সংবাদের কথা ভুলিলেন, তাহার নন গৌর-রুপে ভূমিকা গেল,
তিনি স্বত্ত্বত ভাবে বাসনা পড়িলেন, সেই বিবাহ হইয়া গেল, কেবল
গৌর-রূপ তাহার স্বভাব অস্তিত্বে জাগিয়া রহিল। তাহার দেহ
পুলকে পরিপূর্ণ হইল, নয়ন-কোণে জলধারা বহিতে লাগিল।

এই অবস্থায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে বেল তাহার সময়ের
ঠাড়াইয়া মাথায় ফুল গুঁজিয়া দিতেছে, সহসা নয়ন মেলিলেন,—
খাঁচায় অনিয়ম হাট বাড়াইয়া চঞ্চল বালককে ধরিয়া কোলে তুলিয়া
লইবেন বলিয়া বাসনা করিলেন, কিন্তু তাহা বাসনা মাত্রেই পর্যাবলিত
হইল। তখনই বালকের অস্ত্রধান। আর তিনি উহাকে দেখিতে
পাইলেন না। খাঁচায় যুথ যুথ সহসা এক পরিবর্তন দেখা দিল।

তিনি এই দিন হইতে ভক্তি সহকারে গৌরগোপাল রূপের পূজার
করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রত্যেক দিন এই সময়ে গঙ্গাঘাটে
আসিয়া বালকের প্রতীক্ষা করিতেন, কিন্তু আর উহাকে দেখিতে
পাইতেন না। তাল ফুল, তাল নীবেক, তাল আসন লইয়া
আসিয়েন, গঙ্গাটে পূজার সজ্জ রাখিয়া আনমনা ভাবে গঙ্গায়
অবগাহন করিতেন, দীর্ঘকাল গঙ্গায় দেহ নিমজ্জিত করিয়া চঞ্চল
বালকের প্রতীক্ষা করিতেন, তীরে উঠিয়া, দেখিতেন, বেঞ্চারকার
ফুল সেখানেই আছে, বেঞ্চারকার চন্দন সেখানেই রহিয়াছে, তাহার
পূজার নীবেতে আর সে চমকেকলি-অগুণীর স্পর্শঞ্জ হয় নাই।
খাঁচা অনেক নয়নে কাঁদিয়া কাঁদিয়া। গৌর-গোপালের পূজা করিতেন।
হয়ত তাহার পার্শ্বে লোকেরা চঞ্চল বালকের অত্যাচারে
কথা বলাবলি করিতেন, কিন্তু সে মুহুট আর তাহার দৃষ্টিগোচর হইত
গঙ্গাবাটে।

না। কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন হইয়া এই চঞ্চল বালকের রূপ চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গাবাটে বিষ্ণুপূজা সম্পন্ন করিতেন। গঙ্গাবাটে এই এক নূতন ধরণের বিষ্ণু-পূজা দেখিয়া অভ্যস্ত উপাসকগণের কেছ কেহ উপহাস করিতেন, কেহ কেহ বিখ্যাত হইতেন, কাহারও মনে হইত,—ব্রাহ্মণ পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন।

চঞ্চল বালক নিমাইর শুভ-উদয়ে গঙ্গা-বাটে এই নূতন ধরণের উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাণের প্রাণে কিন্তু প্রাণের ভালবাসা দিয়া, নয়নের জল দিয়া পূজা করিতে হয়, নবদীপের গঙ্গাতীরের কম্পীর উপাসকদের মধ্যে কাহার কাহারের ভাগ্যে এই অনুরাগমনির নব সাধনার সংগ্রহ লক্ষ্য হইত।

( ৪ )

গঙ্গাবাটে শ্রীশ্রীনিমাইচাদরের লীলা অতি মধুময়ী। এক নিমাই-চাদী কতিপয় বংশের নদীগার-হাস্যী তটপুকুরে সনের বেলায় অনন্দ কোলাহলময় করিয়া তুলিতেন। "ঐ এলো", —"ঐ নিল", —
"ঐ গেল", —"ধর ধর" —"বাং—ঐ চলে গেল" —শ্রীঞ্জলিধামের সনের ঘাটে সনের বেলায় কেবল এই রূপ রব গুনা যাইত। কেবল এক নিমাইডাঘে এই অনন্দ-কোলাহলের কারণ হইয়াছিলেন।

গঙ্গাবাটে ধূলিধূলিত নিমাইর ছবি, অজননিত গ্রেমিক ভক্তের ধানের বিষয়,—অনন্যদের বিষয়। সে চিত্র আমরা আঁকিতে অসমর্থ। মাত্তায় ঘনকৃষ্ণ ক্ষুনৌল কুস্তলরাশি—নষ্ঠ কেশদাম কপালের উপর দিয়া মুখ পর্যন্ত ছুলিয়া উড়িয়াছে, বেষ্টিতার মধ্যে—
স্রীশ্রীগোর-বিশ্বপ্রিয় ।

মধ্য দিয়া চঞ্চল, উচ্চ, উঁচুপাথি ও হারিমাক্ষা পল্পলাফ-লোচনের
নিত্য কিরণ বেন সমুদ্রের দিকে বাকাভাবে লতাই পড়িতেছে।
পক্ষিবিহর ভাষ মধ্য লোহিতরাগগুলি ছোট ছোট হথানি
পাতল ওঠের মধ্য দিয়া তুলি কুম্পাপির ভাষ দস্ত হাসির সহিত
বিকৃষ্ট।, স্থাম মুকোমল আয়ত কনক গৌরদেহ হুতিতে ও
লিখন-কালিবিন্দুতে স্থাপিত।

পাঠক, আপনি কি চাপাচুলে বহর লাগার শোভা দেখেন-
ছেন? না দেখিয়া থাকেন তো একবার করিনা নয়নে দেখিন।
তাহার পরে এই কনকচাপার : নিমাইর স্রীগোর লিখন-
কালির বিন্দুপাতে শোভার কথা মনে কর।। তাহা হইলে
গঙ্গাবাট কি বেশে আমাদের নিমাইধাদ পদার্পণ করিতেন,
তাহার আভাস বুঝিতে পারিবেন।

নিমাইধাদ গঙ্গাবাটে জলে অবগাহন করিয়া জলক্রীড়া
করিতেন, বয়স্তরের সঙ্গে কড় রঙ্গ করিতেন, মানার্থিদিগকে
লইয়া কড় কোটুক করিতেন, পরিচিত অপরিচিতের কথা
তাহার বিচারই অসিল না। কোটুক নিমাই যাহাকে পাইতেন,
তাহাকে বাহ্য কোটুক করিতেন। জগ্রাথ মিশ্র ও শ্রীমার
নিকটে পূর্ণদিনই যখান যখান নাশিক কুঞ্জ হইত। চার্জের
রক্ষা এইরূপে কাকটা সাত

নন নন তুচ্ছ মিশ্র পরামর্শবাদ ।

তোমার পুত্রের অভাব কহিব নহ।
গঙ্গাঘাটেত।

তাল মতে করিতে না পারি গঙ্গাঘাটেত।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান।
আরো বলে 'কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিবুগে নারায়ণ মুঞ্জিপ পরতেখ।'

নিমাইচাদ কোতুকজুলে ঠিক কথাই বলিতেন, ভাঙ্গাবানেরা
বুঝিতেন, অভাগিয়ারা বুঝিত না। বাহারা বুঝিতেন তাহারা
গঙ্গাঘাটের ফল হাতে হাতে পাইলেন বলিয়া মনে করিতেন।

কেহ বলিতেন, মিশ্র তোমার পুত্র' আমার শিবলিঙ্গ লইয়া
পলাইয়াছে, কেহ বলিতেন, আমি উত্তরীয় রাখিয়া ধান করিয়ে
জলে নামিয়াছিলাম, ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, তোমার পুত্র আমার
উত্তরী লইয়া উঠাও দোড়িয়া ছুটিয়াছে।

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লইঞ্চ যায় চরণ ধরিয়া।
কেহ বলে আমার না রহে নাজিকুড়ি।
কেহ বলে নয়ে গেছে মোর গীতা পুঁথি।
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া ভাঙ্গ কান্দাহার অপার।
কেহ বলে মোর পূঠা দিয়া কান্দে চড়তে।
"মুইয়ে মহেশ" বলি ঝাপ দিয়া গড়ে।
হই প্রহরেও নাযি উঠে জল হইতে।
মেহ তাহার ভাল ধাকিবে কেমনে।
শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচিবারী প্রাঙ্গণ এইরূপ অভিযোগ গুনিতে পাইতেন। মিশ্র তরজন গর্জন করিয়া গঙ্গাঘাটে পুত্রকে শাসন করিতে যাইতেন, কিন্তু নিমাইকে সেখানে দেখিতে পাইতেন না। নবনারীগণ আসিয়া বলিতেন, “তোমাদের নিমাই গঙ্গাঘাটে জলে ঝাপাইয়া পড়িতেছে, লোকের গায়ে, কুলকুচি দিতেছে, জল ছিটাইয়া অন্ধ করিতেছে, লোকে কত কথা বলিতেছে। অগাধ জলে পড়িতে যে জ্বলিয়া মরিবে, সে ভরও তাহার নাই। কেহ কিছু বলিতে গেলে, তাহাকে বিদ্রোহ করে, আরও অগাধ জলে সাতার দিয়া যাও। ‘এখনও সে গঙ্গায় ঝাপারাপি খেলিতেছে। কত বলিলাম—কিছুতেই উঠিল না,—গেলেই দেখিতে পাবে, এখন।’”

মিশ্র জগন্নাথ তাড়াতাড়ি গঙ্গাঘাটে গেলেন এখানে দেখিলেন যে সে অন্ধ সন্ধ্যাকালে করিলেন, কোথাও খুঁড়িরা পাইলেন না, বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, পুত্র ঘরেই আছে। স্নানের কোনও চিহ্ন নাই, দেহ ধুলিধূলিত, তাহাতে লিখন-কালির দাগ যথা:

আর পথে গেলা ঘরে স্তূ বিশ্বস্তর।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর।
লিখন-কালির বিদ্যা শোভে গৌর-অঙ্গ।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভূঙ।

নিমাই যেন তোল হইতে ফিরিয়া ঘরে আসিলেন। তাহার হাতে পুঁথি, কনকগৌরের দেহে লিখন-কালির বিদ্যা,-টাপাফুলের
উপর ভরমের যায় শৈর্ষেণ্য পাইতেছে। নিমাই বাড়ীতে আসিয়া
গোলাঘাটে।

খালিলেন—“মা তেল দাও, ধান করিতে যাই।” শচী ও মির্শ নিমাইকে দেখিয়া বিশ্বাস হইলেন। যথা—

তৈল দিয়া শচীদেবী গণে মনে মনে।
বালিকারা কি বলিল কিরা বিষয়গুলে।
লিখন-কাগার বিদ্যা আছে সর্ব অঞ্চল।
সেই বন্ধ পরিধান, সেই পৃথি সাগে।
মিশ্র দেখে সর্ব অঞ্চল খলাম ব্যাপিত।
ধান চিহ না দেখিয়া হইল বিশ্বাস।

বিশ্ব শচীদেবীর পুলিশ পাঠকগণের নিকট এই কথাগুলি বেন কেমন-কেমন বোধ হইবে, তাহা আমার বুঝি। যাহাদের নিকট এই সকল কথা কারণমক্ত বলিয়া মনে হইবে, তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না। কেন না, যাহারা ভগবানের অচিন্ত ঐশ্বৰ্যার প্রভাব রুখিতে অসম্ভ, তাহারা আত্মার হাস্য বুদ্ধির যৎকিংকিৎ যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই যথেষ্ট। তাহাদের উপনিষদেই লোকে স্ত্রীরক্তে বুঝিতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও মানসিক গুণে স্বল্পতম বুঝিতে সমর্থ, শিপু অকারাচীন, অমিত্ত্ব বা অস্বাভাবিক তাহার বিস্মৃত্তত বুঝিতে পারে না। যাহা আমার

• তোমার জ্ঞানের অগোচর, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নসম্বন্ধী ও আত্মতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি তাহা অনারসে প্রভাবক দেখিতে পান। অচিন্ত্যোপাদী ঐতিহ্যগুলির পক্ষে এইসকল অনুভূত লীল। অবদৃষ্ট স্মৃত্বন্ত, এবং তাহার এই সকল অলোকিক লীল। দেখিয়াই মনীষ্ঠাপন তাহাদের প্রথম হইতেই ঐতিহ্যগুলি বুঝিয়া লইয়া ছিলেন।